AgEcon SEARCH
RESEARCH IN AGRICULTURAL & APPLIED ECONOMICS

The World's Largest Open Access Agricultural & Applied Economics Digital Library

This document is discoverable and free to researchers across the globe due to the work of AgEcon Search.

Help ensure our sustainability.

Give to AgEcon Search

AgEcon Search
http://ageconsearch.umn.edu
aesearch@umn.edu

*Papers downloaded from **AgEcon Search** may be used for non-commercial purposes and personal study only. No other use, including posting to another Internet site, is permitted without permission from the copyright owner (not AgEcon Search), or as allowed under the provisions of Fair Use, U.S. Copyright Act, Title 17 U.S.C.*

Bangladesh J. Agric. Econ., VIII, 1 (June 1985)

বাংলাদেশে কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তর ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ঃ একটি প্রস্তাবিত মডেল*

আ. মু. মুয়াজ্জাম হুসেইন**

PROCESSES OF AGRARIAN TRANSFORMATION AND INSTITUTIONAL STRUCTURE IN BANGLADESH : A PROPOSED MODEL

A. M. Muazzam Husain

কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তরের লক্ষ্য

কোনও দেশের কৃষিব্যবস্থার রূপান্তর বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি সে দেশের কৃষি ব্যবস্থার একটি ব্যাপক ও ধারাবাহিক ক্রমপরিবর্তনের রূপায়ন। এ রূপান্তর প্রক্রিয়ার গতি প্রকৃতি মূলতঃ সে দেশের প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত উন্নয়ন নীতিমালা এবং বিরাজমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলাদেশ উত্তরাধিকার সূত্রে একটি ঔপনিবেশিক অঞ্চলের অনুন্নত ও অদক্ষ কৃষি ব্যবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে যেখানে উৎপাদন, আয় ও কৃষি শ্রমের কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত অথবা কাম্য প্রসার সম্ভব নয়। অথচ কৃষিভিত্তিক এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রধানতঃ কৃষি উন্নয়নের উপরই নির্ভরশীল। তাই একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে এর উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে এর কৃষি ব্যবস্থাকে পর্যায়ক্রমে একটি উন্নত, আধুনিক ও দক্ষ কৃষি ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে হবে। এ কাম্য রূপান্তরের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হিসেবে ধরে নেয়া যায় উৎপাদনশীলতা, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং একটি সুষম বণ্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত-করণ। এছাড়া একটি স্বনির্ভর ক্রমোন্নতিশীল অর্থনীতি বিকাশের স্বার্থে এর কৃষি থেকে আহরিত উদ্বৃত্ত পরিকল্পিত ভাবে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করতে হবে।

---

*বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীন সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "বাংলাদেশে কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তর" শীর্ষক আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ; ২৫–২৬শে অক্টোবর ১৯৮৪।

**অধ্যাপক, সমবায় ও বিপণন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তরের যে লক্ষ্য উল্লেখ করা হল তা সামগ্রিকভাবে অতীতে কখনও সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। তাই এ দেশের কৃষি ব্যবস্থা কাম্য রূপান্তরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এ বক্তব্য বাস্তবসম্মত ভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। অতীতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলে এ দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে বৃটেনের শিল্প উন্নয়ন কল্পে তার কাঁচামাল সরবরাহের উপযোগী করে গড়ে তোলার কার্যে নিয়োজিত করা হয়েছিল। এছাড়া জমিদারী প্রথা প্রবর্তন করে কৃষিতে এমন একটি উৎপাদন সম্পর্কের সৃষ্টি করা হয়েছিল যার ফলে দেশের কৃষি ব্যবস্থা একদিকে স্থবিরতা ও পশ্চাৎপদতা লাভ করেছিল এবং অপরদিকে এক শোষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৃষি পণ্য উৎপাদক হচ্ছিল নিঃশেষিত। পাকিস্তানী শাসনামলে জমিদারী প্রথার আনুষ্ঠানিক অবসান অবসান ঘটলেও মধ্যসত্বভোগী অনুৎপাদক একটি শ্রেণীর প্রাধান্য প্রকৃতপক্ষে বিলুপ্ত হয়নি। এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায়ও কৃষির লক্ষ্য ছিল প্রধানতঃ উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। শিল্প উন্নয়নের জন্য কাঁচামাল যোগান দেয়াও কৃষি উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক আদর্শগত লক্ষ্য হিসেবে কিছু মৌলিক পরিবর্তনের কথা ঘোষিত হয় এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধির সাথে সুষম বণ্টনের লক্ষ্য প্রথম বারের মত গৃহীত হয় (GOB 1973)। কিন্তু এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের পূর্বশর্তসমূহ কখনই পূরণ করা হয়নি। বিশেষতঃ পচাত্তুরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর কৃষি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা পুণরায় পাকিস্তানী আমলের নীতিমালায় পর্যবসিত হয়।

কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তরের নির্ণায়ক

প্রকৃত পক্ষে যে লক্ষ্যই ঘোষিত হোক না কেন কৃষি ব্যবস্থা ঐতিহাসিক ভাবেই বিবর্তিত হয় কতকগুলো মৌলিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে। সাধারণতঃ বলা যায় যে কোনও দেশের কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়া নির্ভর করে তার ভূমি ব্যবস্থা এবং উৎপাদন শক্তির অবস্থান ও বিকাশের ধারার উপর। যে ভূমি ব্যবস্থায় উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির বিকাশে সহায়ক সেখানেই কৃষি উৎপাদনের বিকাশও সুনিশ্চিত। স্বভাবতঃই আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক উপরিকাঠামো সহ সার্বিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এক্ষেত্রে মৌলিক প্রভাব সৃষ্টি করে।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গুরুত্বপূর্ণভাবে কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়া তথা কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তরকে প্রভাবিত করে। এক দিকে যেমন ভূমি ব্যবস্থায় বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্ককে তা প্রভাবিত করে, অপরদিকে তেমনি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ ও প্রযুক্তি সরবরাহ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব অপরিসীম।

বাংলাদেশের বর্তমান কৃষি ব্যবস্থা ও তার ফলাফল

বাংলাদেশে বিরাজমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এটি একটি কাম্য উৎপাদন ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্যে উপযোগী নয়। ফলে কৃষির বিকাশও ব্যহত হচ্ছে।

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা কৃষিতে ভূমির মালিকানা ও কৃষি ভূমি ব্যবহারের রূপ এবং উৎপাদক শ্রেণী কর্তৃক প্রাপ্ত উৎপন্ন পণ্যের হার নির্ধারিত করে উৎপাদনের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশে ভূমি ব্যবহারের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে ভূমির উপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপের ফলে সৃষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতি খামার, জমির ক্রমবর্ধিত খণ্ডায়ন এবং অসম মালিকানা। অসম মালিকানা ও তার সঙ্গে ভূমি ব্যবহারের সরাসরি সম্পর্কহীনতার ব্যাপকতার ফলে অনুপস্থিত ভূ-স্বামী ও অনুৎপাদক একটি ভোগকারী শ্রেনীর সৃষ্টি হচ্ছে, যুগপৎ ভূমিহীনতা, বর্গা, বেকারত্ব এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। ভূ-স্বামী এবং রায়তের অসম সম্পর্কের ফলে উৎপাদক শ্রেনী উৎপন্ন পণ্যের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং এর ফলে উৎপাদন শক্তির বিকাশ ব্যহত হচ্ছে। একই সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিল্প ও অন্যান্য অকৃষি খাতে অপর্যাপ্ত উন্নয়নের ফলেও গ্রামীন জনশক্তির কর্ম-সংস্থানের হার কমে আসছে। অপর দিকে কার্যকর খামারের আকার ক্ষুদ্র হওয়াতে এবং খণ্ডীকরণের হার বৃদ্ধি পাওয়াতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন তথা উৎপাদন এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ফলে কৃষিতে দ্বিমুখী মেরুকরণ প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হচ্ছে।

এ দেশের কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত আধুনিক উপকরণ ও প্রযুক্তি সরবরাহ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ফলাফল আশাব্যঞ্জক নয়। ১৯৬০ এর দশক থেকে এ দেশের কৃষি উন্নয়ন নীতিমালায় সেচ প্রযুক্তি, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, উফশী বীজ ও কৃষি ঋণকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। উফশী বীজ নির্ভর প্রযুক্তি এ দেশের বহুল ঘোষিত ও আকাঙ্খিত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনয়নে কতটুকু সাহায্য করেছে আর কতটুকু পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশগুলোর রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও সেচ প্রযুক্তির বাজার সম্প্রসারণ করেছে তা আলোচনা সাপেক্ষ। তবে এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশে উফশী ধান বীজ প্রযুক্তি প্রবর্তনের দু'দশক পরেও দেখা গেছে যে বার্ষিক ধান উৎপাদন বৃদ্ধির হার এখনও ২% এর নীচে অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়েও কম। বাংলাদেশে ধান উৎপাদনে ব্যবহৃত মোট জমির শতকরা ২০ ভাগেরও কম উফশী ধানের আওতায় এসেছে। এর মধ্যে প্রধান ফসল আমনের মাত্র ১৫% জমি উফশীর আওতায় এসেছে। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা চলে যে বাংলাদেশে উফশী ধান বীজের ব্যবহার আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি।

বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থায় রূপান্তর প্রক্রিয়ার জটিল বিষয়াদির বিশদ বিশ্লেষণ এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়। তবে উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এধারনা সৃষ্টি অমূলক নয় যে বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থা ও কাঠামো উন্নত ও আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা বিনির্মানে সহায়ক নয়। প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থা এক দিকে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক নয় অন্যদিকে তেমনি এক অসম বণ্টন ব্যবস্থা বিকাশের মাধ্যমে সম্পদ ও আয়ের বৈষম্য ক্রমাগতই বৃদ্ধি করে চলছে। ভূমি ব্যবস্থাও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মৌলিক ও আমূল সংস্কার ব্যতিত কৃষি ব্যবস্থায় দক্ষতা বৃদ্ধি সভব নয়। সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আর্থ-প্রযুক্তিগত বিষয়ের উপর নির্ভরশীলতা কৃষি ব্যবস্থার সুদুর প্রসারী উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সক্ষম নয়।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কি কি সম্ভাব্য বিকল্প কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করা যেতে পারে?

প্রথম বিকল্প হতে পারে পুঁজিবাদি ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি একত্রীকরণ ও বৃহদাকার কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশে যেখানে একদিকে ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং অপরদিকে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে বহুবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে এধরনের ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা অবাস্তব এবং তাই প্রায় অসম্ভব।

পুঁজিবাদি ব্যবস্থায় ভূমি সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদন বিকাশের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উৎপাদনের অবসান ঘটিয়ে বৃহদাকার উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন। কিন্তু এব্যবস্থায় অনুকূল পরিবেশ তখনই সৃষ্টি হয় যখন অর্থনীতিতে শিল্প পুঁজি প্রাধান্য লাভ করে। শিল্প পুঁজির নিজস্ব বিকাশের স্বার্থে উৎপাদিত পণ্যের বাজার ক্রমবর্ধমান হারে বাড়াতে হয়। যেহেতু এ দেশে জনসংখ্যার অধিকাংশই গ্রামে বাস করে এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল তাই এ বিশাল জনগোষ্ঠির ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হলে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে সামন্তবাদী অবশেষগুলোর বা প্রাক্-পুঁজিবাদি উৎপাদন সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে।

বাংলাদেশে প্রকৃত পক্ষে এখনও শিল্প পুঁজির প্রাধান্য স্থাপিত হয়নি। বর্তমানে ব্যবসায়ী পুঁজি এদেশে প্রাধান্য বিস্তার করছে। উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যবসায়ী পুঁজির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য নয়। মজুদদারী, মুনাফাখোরী ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, এমন কি উৎপাদন সংকোচনের মাধ্যমেও তারা মুনাফার হার বৃদ্ধি করার প্রয়াস পায়। তাই বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে বৃহদাকার উৎপাদন সংগঠনের পুঁজিবাদি সহায়ক শক্তিগুলোর অভাব দৃষ্ট হচ্ছে।

দ্বিতীয় বিকল্প হচ্ছে ভূমি ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ যা একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ই সম্ভব। অতএব বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোর আওতায় এ বিকাশের আলোচনা নিরর্থক প্রতীয়মান হতে পারে।

তবে তৃতীয় একটি বিকল্প বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। তা হলো বর্তমান ব্যক্তিমালিকানা ব্যবস্থা বজায় রেখে ভূমি একত্রীকরণের মাধ্যমে বৃহদাকার উৎপাদন নিশ্চিত করা, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের পথ সুগম করা, উৎপাদন উপকরণের সরবরাহ সুসংহত করা এবং শ্রমের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উৎপাদনে উৎসাহ বৃদ্ধি তথা জমি ও শ্রমের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক সম্পর্ক গড়ে তোলা। এ বিকল্প পথ সমবায় কৃষি উৎপাদনের পথ। এ সমবায় বলতে অবশ্য বর্তমানে প্রচলিত সমবায় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বিশেষিত নতুন সমবায়ের কথা বোঝায়।

এ প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় সমবায় সহ সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিশ্লেষণ করে কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তরে এর প্রভাব নির্ণয় এবং কাম্য রূপান্তর প্রক্রিয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও এর সহায়ক একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রণয়ন।

বাংলাদেশে সমবায়ের অতীত এবং বর্তমান

ঔপনিবেশিক আমলে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রসূত জমিদারী প্রথা এবং মহাজনী প্রথার কুফলগুলো উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এমন চরমরূপ পরিগ্রহ করে যে এদেশের দরিদ্র কৃষককুল দ্রুত নিঃস্ব এবং ভূমিহীনতার পথে ধাবিত হয় এবং গ্রামীন ঋণগ্রস্ততা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ অবস্থা নিরসনে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের অব্যবহিত ফলস্বরূপ বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

১৯০৪ সালে একটি সমবায় আইন পাশের মাধ্যমে এদেশে সরকারীভাবে প্রথম সমবায় সমিতি চালু করা হয়। এ আইন অনুযায়ী সরকারী সাহায্য ও নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ ও ঋণ দানের উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতিগুলো গঠিত হত। অন্যান্য ধরনের সমিতি গঠনের সুবিধার্থে ১৯১২ সালে আইনটি সংশোধিত হয়।

মূলতঃ সরকারী তহবিল থেকে সহজ শর্তে এবং স্বল্প সুদে ঋণ দানের ব্যবস্থা থাকার দরুন প্রাথমিক পর্যায়ে সমবায় সমিতির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯০৭ সালে যেখানে ছিল ২২২টি সমিতি সেখানে ১৯৩৬ সালে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩০০০এ। ১৯২৯ সালে বিশ্ব-অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে সমবায়ের প্রসার সর্ব প্রথম বাধাগ্রস্ত হয়। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় কৃষি ঋণ গ্রহীতা আইন প্রবর্তনের ফলেও সমবায় সমিতিগুলো আর্থিক দিক থেকে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর পর ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের ফলে সমবায় সমিতিগুলো আবার গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং সমবায় প্রশাসনও বিপর্যস্ত হয়। দেশ বিভাগের পর পর সরকার সমবায় সমিতিগুলো পুনর্গঠনের নীতি গ্রহণ করে গ্রামভিত্তিক একমুখী সমবায় সমিতিগুলির পরিবর্তে ইউনিয়ন ভিত্তিক বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৬০-৬৫) কিছু সংখ্যক সমবায় উন্নয়ন প্রকল্পও গৃহীত হয়।

কুমিল্লা পদ্ধতির সমবায় ব্যবস্থা প্রচলনের পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত সমবায় ব্যবস্থাগুলোর মূল কাঠামো নিম্নরূপ: ঋণ দান সমিতির একটি ত্রি-স্তর বিশিষ্ট কাঠামো যার প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রামভিত্তিক ঋণদান সমিতি, মধ্যম পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক এবং উপরের স্তরে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক। যদিও ১৯১২ সালের সংশোধিত সমবায় আইন অনুযায়ী অ-ঋণদান সমিতিও গড়ে উঠার ব্যবস্থা ছিল, তবুও প্রকৃতপক্ষে এদেশের সমবায় কাঠামোর মধ্যে ঋণদান সমিতিগুলোই পূর্বাপর প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল। সকল প্রকার সমিতির ৮০% ছিল ঋণদান সমিতি। ১৯৪৭ সালের পর অবশ্য গ্রামভিত্তিক ঋণদান সমিতিগুলো পুনর্বিন্যস্ত করে ইউনিয়ন ভিত্তিক বহুমুখী সমবায় সমিতিতে রূপান্তরিত করা হয়। তবুও কার্যতঃ এগুলোর কার্যকলাপ ঋণ দানের মধ্যেই সীমিত ছিল।

সঞ্চয় আমানতের মাধ্যমে নিজস্ব মূলধন সৃষ্টির ব্যবস্থা থাকলেও এদেশের সমবায় সমিতিগুলো সরকারী তহবিলের উপর প্রায় পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল। সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে যে পরিমাণ ঋণ সমবায় সদস্যগণ পেতেন তা ছিল নগণ্য এবং চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত অল্প। তবু-

পরি ছিল ঋণ ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা। সাধারণতঃ সমিতির মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী সদস্যরাই ঋণের সুযোগ গ্রহণ করতেন। উপরন্তু ঋণ পরিশোধের হারও ছিল অত্যন্ত অসন্তোষজনক। ফলে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে এক সময় সমিতিগুলো অকেজো এবং মৃতপ্রায় হয়ে পড়ত। এখানে উল্লেখ করা যায় যে ১৯৪৮ সালে ৯৮% সমিতি ছিল অকেজো বা অসচ্ছল সমিতি।

সমবায় সমিতিগুলো কেবলমাত্র স্বল্প মেয়াদী ঋণের লেনদেন করতো। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের জন্য সারা দেশে কয়েকটি ভূমি বন্ধকী ব্যাংক স্থাপিত হয়। ১৯৬১ সালে এধরনের দশটি ব্যাংক ছিল।

ঋণদান সমিতি ছাড়া কয়েক ধরনের বিশেষ কৃষি সমবায় সমিতিও দেশে প্রচলিত ছিল। যেমন কৃষি সমিতি, অনাবাদী জায়গায় নতুন উপনিবেশকারী সমিতি, সেচ সমিতি, ভূমি পুনরুদ্ধার সমিতি, তামাক উৎপাদন সমিতি, ইক্ষু উৎপাদন সমিতি, শাক-শব্জি উৎপাদন সমিতি, ইত্যাদি। পরবর্তীকালে মৎস্য উৎপাদন সমিতিও গঠিত হয়।

বাংলাদেশের সমবায় সমিতিগুলো সম্পর্কে এপর্যন্ত আলোচনায় উদ্ভাসিত চিত্রটি কোন রকমেই উৎসাহব্যঞ্জক নয় (Husain 1964)। সার্বিক চিত্রটি মোটামুটি নিম্নরূপ :

(১) সমবায় ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণভাবে সরকারী আইনের আওতায় সরকারী উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিচালিত। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যাপক আকারে কোন সমবায় আন্দোলন গড়ে উঠেনি। জনগণকে সমবায় নীতিমালার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যকভাবে প্রস্তুত ও প্রশিক্ষিত না করেই এ ব্যবস্থা উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল।

(২) সমিতিগুলোর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর মূলে ছিল ঋণ সর্বস্বতা তাও আবার স্বাবলম্বন ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে নয়, নিতান্তই সরকারী তহবিল নির্ভর। উপরন্তু ঋণের পরিমাণ ছিল নিতান্ত অপ্রতুল, এর ব্যবস্থাপনা ছিল মারাত্মকভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং ঋণ পরিশোধের অবস্থাও ছিল শোচনীয়ভাবে খারাপ। সাধারণের ধারণা অনুযায়ী সমবায় সমিতি ছিল সরকারী সাহায্য সহায়তা গ্রামীন কায়েমী স্বার্থবাদীদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারার একটি ব্যবস্থা। সমবায়ের কার্যক্রম মূলতঃ ঋণ কর্মসূচীর মধ্যে সীমিত থাকার ফলে কৃষকের সার্বিক সমস্যা সমাধানের নিশ্চয়তা প্রদানে এ সমবায় ছিল সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ।

(৩) সমবায়ের প্রতি নিম্নবিত্ত জনসাধারণের কোন আর্কষণ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ৭৫% গ্রামীন পরিবারই এর আওতা বহির্ভূত ছিল। অন্যদিকে কৃষকদের ঋণ চাহিদার ৫০% ও সমবায়ের মাধ্যমে পূরণ হয়নি। তাই কৃষি উৎপাদনে সমবায় কোনই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়নি।

(৪) সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রধান লক্ষ্য যদিও ছিল সহজ শর্তে ঋণ দানের মাধ্যমে দরিদ্র কৃষকদের মহাজনী শোষণ থেকে মুক্ত করা, বাস্তবে সেটা তো কার্যকরী হয়ই নি, উপরন্তু সুবিধাভোগী শ্রেণীর করায়ত্ব হয়ে সমবায় ব্যবস্থা সম্পদ এবং আয়ের বৈষম্যকে আরও বৃদ্ধি করতেই সহায়তা করেছে।

(৫) সমিতি গঠন, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নীতিমালা পালিত হয়নি। নেতৃত্বের দুর্বলতা, সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতা ও উপযুক্ত কর্মী সৃষ্টি প্রয়াসের অভাব প্রকটভাবেই পরিলক্ষিত। হিসাব সংরক্ষণের দিকটি যে গুরুতরভাবে অবহেলিত ছিল, কেবল তা নয়, এমন প্রমাণও বিদ্যমান যে প্রশাসন থেকে বরং বহুক্ষেত্রে অনিয়ম সৃষ্টির সহায়তাই করা হয়েছে (Ballendux and Harper)।

(৬) সমবায় আইন যে শুধু সুষ্ঠু সমবায় আন্দোলন সৃষ্টির প্রতিকূলে ছিল তাই নয়। এ আইনের অবাস্তবতা এবং এর অপপ্রয়োগের মাধ্যমেও সমবায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। অতএব এ সমবায়ের ইতিহাস এক ব্যর্থতার ইতিহাস। অবশ্য একে সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতা অপেক্ষা সমবায় সংক্রান্ত সরকারী আইনের ব্যর্থতা বলাই শ্রেয়।

কুমিল্লা পদ্ধতি

১৯৬০ এর দশকের গোড়ার দিকে কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে একটি উন্নততর সমবায় পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয় যা সাধারণভাবে কুমিল্লা পদ্ধতি নামে আখ্যায়িত। এ পদ্ধতি প্রচলিত সমবায় ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উপর এক অনুকূল প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। কুমিল্লা পদ্ধতিতে ঋণকে কৃষি উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত করে তদারকি ঋণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ঋণের উৎপাদনমূলক ব্যবহার এবং ঋণ পরিশোধ ব্যবস্থার উন্নতি করা হয়েছিল। আদর্শ কৃষককে প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে উন্নত কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির ব্যবহার ও বিস্তার লাভে এ পদ্ধতি অবদান রেখেছিল।

দ্বি-স্তর বিশিষ্ট এ পদ্ধতির প্রাথমিক স্তরে গ্রাম ভিত্তিক সমবায় সমিতি আর উপরের স্তরে রয়েছে উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি। আদর্শ কৃষক, ম্যানেজার ও অন্যান্য সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক সমিতিগুলোর ঋণসহ বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ, তদারকি, ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে উপজেলা সমিতি প্রাথমিক সমিতিগুলোকে সাহায্য করে যাবে।

কুমিল্লা পদ্ধতির সাফল্যের ফলে ১৯৭১ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে সমগ্র দেশে 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী'র মাধ্যমে এ পদ্ধতি বিস্তার লাভ করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে এ পদ্ধতিরই প্রাধান্য। ৪০০ এর অধিক উপজেলায় এ পদ্ধতি সম্প্রসারিত হয়েছে। অবশ্য এখনও সমবায় পরিচালনা দফতরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কিছু সংখ্যক ইউনিয়ন ভিত্তিক বহুমুখী সমিতি এবং বিশেষ ধরনের সমিতি রয়েছে (যেমন, ইক্ষু চাষী সমিতি, মৎস্যজীবি সমিতি, ইত্যাদি)।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান রূপে সৃষ্ট হলেও সমবায় পরিচালনা দফতরটিও বহাল রাখা হয়। পরবর্তীতে এর কর্মসূচী আংশিক পরিবর্তিত হলেও সমবায় সংগঠন ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসনের এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেনি। পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী সমবায়ের ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় এবং এর সাফল্যের সম্ভাবনাকে আরও বৃদ্ধি করে গ্রামভিত্তিক বহুমুখী সমবায় কাঠামোর মাধ্যমে সকল,

ঋণ, উৎপাদন, বিপণন ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয় সাধন করার কথা। উন্নত কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি প্রচলন সহ কৃষি উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন গ্রামীন শিল্প উন্নয়নেও সমবায় পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিত করার কথা। তাছাড়া গ্রামীন আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো গড়ে তুলে এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যের মাধ্যমে একটি প্রকৃত সমন্বিত গ্রামোন্নয়নের কাঠামো রচনা করা এ কর্মসূচীর লক্ষ্য। গ্রামীন সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে যৌথ চেতনাবোধ সৃষ্টি, এমন কি যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলনও এ কর্মসূচীর উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

অথচ বাস্তবে তার লক্ষ্য সাধনে এ কর্মসূচী অদ্যাবধি যে সাফল্য লাভ করেছে তা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয় (Khan 1979; Ali 1976; GOB 1980; Blair 1974)। দ্বি-স্তর বিশিষ্ট এ সমবায় সংগঠনের ফলাফল সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে পর্যালোচনার করা যেতে পারে।

(১) কর্মসূচীর উদ্দেশ্য অনুযায়ী গ্রামভিত্তিক বহুমুখী সমিতি সংগঠন করার কথা। কার্যতঃ দেখা যাচ্ছে যে সমিতিগুলোর কার্যক্রম বহুলাংশে শুধু ঋণ দান কর্মসূচীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঋণের ক্ষেত্রেও কার্যক্রমের ফলাফল সন্তোষজনক নয় বলেই ধরে নেয়া যায়। খেলাপী ঋণের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী।

(২) সমিতিগুলো নিজস্ব মূলধন সৃষ্টির প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জনেও ব্যর্থ হয়েছে। ক্রমান্বয়ে ঋণের ব্যাপারে ব্যাংকের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নিয়ে আসার কথা, তা বাস্তবে সম্ভব হয়নি।

(৩) প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উপজেলায় এ কর্মসূচী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কিন্তু যে সব এলাকায় চালু হয়েছে সেখানকারও মাত্র ২০% পরিবার সমবায়ের আওতায় এসেছে। অর্থাৎ গ্রামীন জনগণের মাত্র একটি ক্ষুদ্রাংশ এ সমবায় কর্মসূচীর সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারছে। ফলে গ্রামীন অর্থনীতিতে এর প্রভাব অত্যন্ত সীমিত।

(৪) উপরন্তু বহু সমীক্ষা থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় গ্রামীন স্বল্প সংখ্যক সমবায়ী সদস্যদের মধ্যেও একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীই মূলতঃ সমবায়ের সুযোগ সুবিধাগুলো ভোগ করছে এবং সমিতিগুলোতে তাদের প্রাধান্যই বজায় থাকছে। এতে গ্রামীন সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধিতেই প্রকারান্তরে এ কর্মসূচী সহায়তা করছে। অসম গ্রামীন ক্ষমতার কাঠামোই মূলতঃ এর জন্য দায়ী।

(৫) গ্রামীন জনগণের বৃহত্তর অংশ ভূমিহীন। কুমিল্লা পদ্ধতির সমবায়ের কাঠামোতে ভূমিহীনদের কোন স্থানই ছিল না। অবশ্য অতি সম্প্রতি ভূমিহীনদের জন্য বিশেষ সমবায় গঠনের এক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলাফল পর্যালোচনা এখনও করা সম্ভব নয়। পশুপালন এবং মৎস্য চাষের জন্য সীমিত পরিমাণে ঋণ দান ছাড়া তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে এগুলো সক্ষম হয়নি।

(৬) এ সমবায় কাঠামো অনুযায়ী যে ধরনের সমবায় সংগঠন প্রসারের চেষ্টা চলছে সেগুলো মূলতঃ সেবা মূলক (Service) সমিতি। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সঠিক গ্রামোন্নয়নের জন্য যে ধরনের সমবায় প্রয়োজন সেগুলি উৎপাদন বা আবাদী সমিতি, বিশেষ করে খাস

জমি, উদ্বৃত্ত জমি, ইত্যাদি সুষ্ঠু বণ্টনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুষম বণ্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে উৎপাদন সমবায় ছাড়া গত্যন্তর নেই, এ ব্যাপারে বর্তমান সমবায় কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন।

(৭) বর্তমান সমবায় পদ্ধতি ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বহাল রাখছে। সমবায় কর্মসূচীতে যৌথ কার্যক্রমের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে যার ফলস্বরূপ যৌথ চেতনা বোধের সৃষ্টি বহুল পরিমাণে ব্যহত হচ্ছে।

সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী বর্তমানে তার প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোড', নামে পুর্ণর্গঠিত হয়েছে। সংশোধিত কাঠামোতে অধিকতর আন্তঃমন্ত্রনালয় সমন্বয় এবং ভূমিহীন সমবায় সমিতি গঠনের পরিকল্পনা ব্যতিত সাংগঠনিক তেমন কোনও মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়নি।

সমবায়ের উপর সাম্প্রতিক কালে গৃহীত কতিপয় সরকারী নীতিমালার প্রভাব

বাংলাদেশে কৃষি সংক্রান্ত নীতিমালায় সাম্প্রতিক কালে যে কয়টি পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে তার বিরূপ প্রভাব সমবায় প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর পড়েছে। যেমন সাম্প্রতিক কালে বিশেষ কৃষি ঋণ কর্মসূচী চালু করা হয়েছে (বস্তুতঃ ১৯৭৭ সালের একশত কোটি টাকা কৃষি ঋণ কর্ম-সূচী থেকেই এটা শুরু হয়েছে)। এ কর্মসূচী অনুযায়ী সহজ শর্তে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক-সমূহ এবং কৃষি ব্যাংক সরাসরি কৃষকদের ব্যক্তিগত ঋণ দান করতে পারে। এতে কোন বন্ধকীও লাগেনা। এর ফলে স্বভাবতই একজন কৃষক সমবায়ের ওপর তার নির্ভরশীলতা কমাবে। কারণ যেখানে সমবায়ের সদস্য হতে হলে তাকে বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে এবং সদস্য হতে হলে তাকে বিভিন্ন আইন নির্ধারিত দায় দায়িত্বও বহন করতে হবে সেখানে সে এককভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যাংকের সাথে সরাসরি লেনদেন করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সমবায় ঋণের জন্য বন্ধকী ব্যবস্থা চালু আছে কিন্তু বিশেষ কৃষি ঋণের জন্য বন্ধকী বা আমানতের প্রয়োজন হয় না। তৃতীয়তঃ সমবায়ের সদস্য হিসেবে তাকে বিশেষ কৃষি ঋণের সুদ অপেক্ষা অনেক বেশী হারে কৃষি ঋণের সুদ দিতে হয়। ফলে সরকার একদিকে সমবায় ব্যবস্থাকে জোরদার করার দৃঢ় সং-কল্পের কথা অহরহ ঘোষণা করছেন অপরদিকে একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক কৃষি ঋণ ব্যবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী একটি নীতি হিসেবে দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে।

অপর একটি দৃষ্টান্ত হলো এই যে বর্তমান সরকার সার, কীটনাশক ও সেচ যন্ত্র সরবরাহ ও পরিচালনায় অবাধ ব্যক্তি মালিকানা ব্যবস্থা চালু করার নীতি গ্রহণ করছেন। এর ফলে অবশ্য-ম্ভাবীভাবে সমবায় ব্যবস্থাকে দূর্বলতর এমন কি বহু ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় করে তুলছে। সম্প্রতি সেচ প্রকল্পের ওপর একটি সমীক্ষা থেকে (Husain *et al* 1984) প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে

টাঙ্গাইল জেলায় তিনটি উপজেলার বহু গভীর এবং অগভীর নলকূপ প্রকল্প ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে। এমন কি সমবায় সমিতি হিসেবে রেজিষ্ট্রিকৃত সংগঠনের আওতাভুক্ত নলকূপগুলোরও একই অবস্থা। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এ সব এলাকায় নলকূপ প্রকল্পের পরিচালকরা বা মালিকরা সেচের পানির মূল্য হিসেবে পানি ব্যবহারকারী কৃষকের প্রাপ্ত ফসলের $\frac{1}{5}$ থেকে $\frac{1}{3}$ অংশ পর্যন্ত ফসল আদায় করে থাকেন। একটি এলাকায় অবশ্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার মাধ্যমে সেচের পানির মূল্য পরিশোধ করতে হয়। সেচের পানির মূল্য যেখানে ফসলের অংশ হিসেবে দেয়, সেখানে একর প্রতি ১৬০০.০০ টাকা থেকে প্রায় ২৪০০.০০ টাকা পর্যন্ত সেচ মূল্য আদায় করা হয়ে থাকে। আরও দেখা গেছে যে এ হারে সেচ মূল্য আদায় করা হলে ১.১৮ বছর থেকে ৫ বছরের মধ্যে নলকূপের বিনিয়োগ মূল্য পুরোপুরি উঠে আসবে। অবাধ ব্যক্তি মালিকানাধীন নলকূপ সরবরাহ নীতির ফলে গ্রামাঞ্চলে যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চেতনাবোধ ও বৈষম্যমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে এটি তার একটি উদাহরণ মাত্র।

বর্তমান সমবায় পদ্ধতির উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে এ দেশের কৃষি ব্যবস্থার কাম্য রূপান্তরে এর সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার আভাষ পাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশে বর্তমানে পরিচালিত বিভিন্ন সমবায়মুখী উন্নয়ন প্রকল্প থেকেও একই চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠে। এর মধ্যে রয়েছে স্বনির্ভর কর্মসূচী, ক্ষুদ্রচাষী উন্নয়ন প্রকল্প, গ্রামীন ব্যাংক প্রকল্প, বিভিন্ন বেসরকারী পর্যায়ে গৃহীত স্বল্পবিত্তদের জন্য পরিচালিত প্রকল্প।

মূলত: বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো বজায় রেখে উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ও গ্রামীন অসম সম্পদ মালিকানা ভিত্তিক অসম ক্ষমতার কাঠামোর মৌলিক কোন সংস্কার ব্যতিরেকে কেবলমাত্র আর্থ-প্রযুক্তিগত উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে পরিচালিত এসব প্রকল্প গ্রামীন দরিদ্র পরিবার সমূহের বিস্বকরণ প্রক্রিয়াকে শুধু দীর্ঘায়িত করতে পারে। এ প্রক্রিয়ার বিলোপ সাধন করে কৃষি ব্যবস্থাকে কাম্য রূপান্তরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এসব কর্মসূচী ও নীতিমালা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

নতুন সমবায় ব্যবস্থাধীন স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও তার রূপরেখা

সমবায়ের ক্ষেত্রে অসম আর্থ-সামাজিক ক্ষমতার কাঠামো এর কাম্য উদ্দেশ্যসাধনে বাধা স্বরূপ বিদ্যমান। মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী শ্রেনীর কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ। এ অসম ক্ষমতা কাঠামো প্রশাসন ও প্রশাসনিক নীতি প্রণয়নেও অনুরূপভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের আধিপত্যও বিদ্যমান ক্ষমতা বলয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এ অবস্থার পরিবর্তন আনয়ন করে কৃষি ব্যবস্থাকে কাম্য রূপান্তরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে এবং তার সহায়ক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে সমবায়কে কার্যকরীভাবে গড়ে তুলতে হলে মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন আনয়ন করতে হবে। কাঠামোগত মৌল পরিবর্তনের নামান্তর হিসেবে এক নতুন সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

পূনর্গঠিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রবর্তনের দুটো প্রধান পূর্বশর্ত রয়েছে। এগুলো হচ্ছে— (১) একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন যেখানে প্রশাসন এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাবে এবং (২) জমিসহ উৎপাদন উপকরণ সমূহের পূণর্বণ্টন ও পূণর্সমাবেশ।

প্রথম পূর্বশর্ত পালনের জন্য প্রয়োজন প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনে প্রকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের প্রাধান্য। বর্তমান সরকার ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করেছেন বলে আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হচ্ছে। তবে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রশাসনকে জনগণের সন্নিকটে নিয়ে গেলেই চলবে না এতে জনগণের কর্তৃত্ব স্থাপন না করা পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণের মূল লক্ষ্য অর্জিত হবে না। উপরন্ত এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে প্রথম শর্তটি সরাসরিভাবে দ্বিতীয় পূর্বশর্ত পরিপূরণের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য আরও প্রয়োজন বর্তমান উন্নয়ন পরিকল্পনা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন। স্থানীয় সম্পদ, তার সুষ্ঠু ব্যবহার এবং একটি বাস্তবমুখী উন্নয়ন চাহিদার উপর ভিত্তি করে প্রশাসনের প্রাথমিক স্তরে পরিকল্পনার খসড়া তৈরী হবে। প্রকৃত পক্ষে গ্রাম থেকে এর উৎপত্তি হতে পারে যা উপজেলা পর্যায়ে একত্রীকরণ ও সমন্বিত হবে এবং জেলা হয়ে [illegible] কেন্দ্রীয় স্তরে পৌছবে। সেখানে জাতীয় চাহিদা এবং প্রাপ্ত সম্পদের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে সংশোধনের সুপারিশ করা হবে যা পুনরায় প্রশাসনের নিম্নস্তরে (উপজেলায়) যেয়ে চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। এ ধরণের পরিকল্পনা একাধারে বাস্তবমুখী, জাতীয় লক্ষ্যের অনুকূল এবং জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের নিশ্চয়তা দেবে। ফলে এর বাস্তবায়নের দক্ষতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয় পূর্বশর্ত পালন করতে হলে ভূমি মালিকানা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে ভূমির ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনার পূর্ণবিন্যাস প্রয়োজন। বাংলাদেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে ভূমিমালিকানা সীমিত করণ একান্ত প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে অসম সম্পদ মালিকানা দেশে যে বৈষম্যমূলক ক্ষমতা কাঠামো সৃষ্টি করেছে তা দূর করতে হলে শুধু ভূমি নয় অন্যান্য সম্পদের মালিকানার বৈষম্যও দূর করতে হবে। অন্যথায় প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে প্রশাসন এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের নিশ্চয়তাও প্রদান করা সম্ভব হবে না।

প্রস্তাবিত রূপরেখার একটি বিবরণী প্রবন্ধটির পরিশিষ্ট হিসেবে পেশ করা হয়েছে। সংক্ষেপে, এতে গ্রামকে উৎপাদনের প্রাথমিক স্তর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠনের জন্যে একটি গ্রাম উৎপাদন সমবায় সমিতি থাকবে। অবশ্য এর আওতাভুক্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদন দল থাকবে। গ্রামের সীমিত প্রসাশনিক ও উন্নয়ন দায়িত্বও থাকবে। প্রশাসনের প্রাথমিক স্তর হিসেবে গ্রামের প্রাপ্ত বয়স্ক অধিবাসী মিলে গ্রাম সভা গঠিত হবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গ্রাম পরিষদ গঠিত হবে। গ্রাম সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পেশাভিত্তিক অঙ্গ দল বা গ্রুপের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গ্রাম সমবায়ের পরিচালনা কমিটি গঠিত হবে।

গ্রাম সমবায় গ্রামের কৃষি উৎপাদনসহ সকল উৎপাদন কর্মসূচীর পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও তদারকীর দায়িত্ব পালন করবে; গ্রাম পরিষদের মাধ্যমে উৎপাদন উপকরণ সংগ্রহ করে গ্রুপগুলির মধ্যে বিতরণ করবে এবং হিসাব সংরক্ষণের ব্যবস্থাও গ্রহণ করবে।

গ্রামের কৃষি জমি কয়েকটি ব্লকে বিভক্ত হবে। ভূমি মালিকানার সিলিং সাপেক্ষে যে সব জমি মালিকের পারিবারিক শ্রমদ্বারা চাষ করা হবে না তার ব্যবহার সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হবে। সমিতি উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশ মালিককে দিবে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত পর্যায়ে বর্গাপ্রথা ইত্যাদি বিলুপ্ত হবে।

জমির তালিকা ও রেকর্ড প্রণয়নে গ্রাম পরিষদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকবে। সকল জমির ক্রয় বিক্রয় এবং হস্তান্তর গ্রাম পরিষদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। সাধারণতঃ অনুপস্থিত অথবা অনুৎপাদক মালিকদের এসব বিষয়ে অবাধ অধিকার থাকবে না।

প্রস্তাবিত রূপরেখাতে বিধৃত বণ্টন পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রামের মাড়াই কেন্দ্রে উৎপাদিত ফসল সংগৃহীত হবার পর একটি অংশ সমবায় তার দেয়া উপকরণ মূল্য এবং অন্যান্য খরচ বাবদ রেখে দেবে। একটি অংশ সংরক্ষিত হবে সমবায়ের সঞ্চয় ও মূলধন তহবিল এবং গ্রাম পরিষদের নির্ধারিত তহবিলের জন্য। বাকি ফসল জমি এবং শ্রমের আনুপাতিক হারে বণ্টিত হবে।

গ্রামের উদ্বৃত্ত ফসল সমবায় গুদামে সংরক্ষিত হবে এবং বিপণন ব্যবস্থাও সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। সরকার তার ফসল সংগ্রহ অভিযান গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালিত করবে। উপকরণের মূল্য বাবদও সরকারকে আংশিকভাবে ফসল প্রদান করা যেতে পারে। এ ব্যবস্থার সুফলগুলি নিম্নরূপ:—

(ক) বর্তমান ভূমি মালিকানা ও উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় পরিকল্পিত ভাবে জমির একত্রীকরণ এবং জমি, শ্রম ও অন্যান্য উপকরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার সহজতর হবে।

(খ) গ্রামীন উৎপাদন কর্মকাণ্ড সমন্বিতভাবে পরিচালনার মাধ্যমে গ্রামীন জনশক্তির মধ্যে যৌথ চেতনাবোধ সৃষ্টি হবে এবং বৈষম্যমূলক উৎপাদন ব্যবস্থা দূর করা সহজতর হবে।

(গ) উৎপাদন এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে স্বয়ম্ভর পদ্ধতিতে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে।

(ঘ) একটি সুষম বণ্টন ব্যবস্থার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে।

রূপরেখার কাঠামোতে উচ্চতর প্রশাসনিক ও উন্নয়ন স্তরের সাথে গ্রামের সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রশাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে উপজেলা পরিষদ এলাকাধীন গ্রামসমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন করবে। উপজেলা পরিষদের প্রধান থাকবেন

একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। অন্যান্য নির্বাচিত সদস্য ছাড়াও উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ পরিষদের সদস্য থাকবেন।

উপজেলা পরিষদ এলাকায় জনশক্তির কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সার্বিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন করবে। কৃষি নির্ভর এবং কৃষি বহির্ভূত শিল্প ও অন্যান্য সামাজিক অবকাঠামো স্থাপনেও উপজেলা কর্মসূচী গ্রহণ করবে। প্রস্তাবিত কাঠামোতে ইউনিয়ন পরিষদকে আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে বাহুল্য বিবেচনা করে এর বিলুপ্তির প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

এ রূপরেখা বাস্তবায়নের জন্য পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণের পরবর্তী পর্যায়ে গ্রামীন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পুনর্গঠিত করা যেতে পারে। গ্রাম পরিষদ গঠনের পরবর্তী পর্যায়ে গ্রাম সমবায় কর্মসূচী প্রণয়ন এবং তার কর্মসূচী প্রণয়ন ও তার কর্মসূচীর ক্রমবিস্তৃতি ঘটানো যেতে পারে। অবশ্যই প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে সীমিত সংখ্যক গ্রাম বাছাই করে এ কর্মসূচীর কার্যকারিতা বিচার করে ক্রমান্বয়ে তা প্রসারিত করা যুক্তিযুক্ত হবে। আরও প্রস্তাব করা যেতে পারে যে গ্রাম ভিত্তিক উৎপাদন সমবায় সমিতি গঠনের কর্মসূচী প্রবর্তনের পূর্বেই সরকারী খাস, জেগে ওঠা চর ও সিলিং উদ্বৃত্ত জমির সুষ্ঠু বন্টন ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে দুই ধরনের উৎপাদন সমবায় সমিতি প্রবর্তনের কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে। এ জমি দুই প্রকারের হতে পারে এবং তদনুযায়ী দুই স্তরের সমিতি গঠন করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ যেখানে উপরোক্ত ধরনের জমি বিচ্ছিন্নভাবে এবং ক্ষুদ্রাকারে পাওয়া যাবে সেখানে গ্রামে প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত সমবায় সমিতির নিকট হস্তান্তরের অযোগ্য শর্তে জমি চাষাবাদের জন্য বন্টন করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে এ সব সমিতিকে সরকার কর্তৃক সুবিধাজনক বিশেষ শর্তে উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহ করতে হবে। এ ধরনের সমিতি তার উৎপাদন পরিকল্পনা অনুযায়ী জমির অংশবিশেষ তার সদস্যদের মাধ্যমে চাষ করাতে পারে তবে বন্টন পদ্ধতি সমিতির নির্ধারিত উপবিধি অনুযায়ী স্থিরীকৃত হবে। এখানে প্রাপ্ত জমি সমিতির সদস্যদের চাহিদার তুলনায় কম হলেও সমিতি তার বিভিন্ন মুখী কর্মসূচীর একটি অংশ হিসেবে এ জমি চাষাবাদ করবে।

দ্বিতীয়তঃ যেখানে একত্রিতভাবে বৃহদাকার উৎপাদনের উপযোগী পর্যাপ্ত জমি পাওয়া যাবে সেখানে যৌথ চাষাবাদের জন্য ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষক সমন্বয়ে সমবায় খামার গঠন করা যেতে পারে। এখানেও হস্তান্তরের অযোগ্য শর্তে সমবায় সমিতিকে জমি দেয়া হবে। সমিতি জমিসহ বিভিন্ন উপকরণের সুপরিকল্পিত ব্যবহার ও সমন্বয় সাধন করবে এবং নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি করবে। এক্ষেত্রেও কারিগরি সাহায্য, যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন উপকরণ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রথম পর্যায়ে সরবরাহ করা হবে যাতে সমিতিগুলো প্রাথমিক বাধাবিপত্তি কাটিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

প্রথম স্তরের সমবায় সমিতি অপেক্ষা দ্বিতীয় স্তরের সমবায়গুলো তুলনামূলকভাবে উন্নত পর্যায়ের। এখানে ভূমিসহ বিভিন্ন উপকরণের অধিকতর সমন্বয় সাধন করা হবে। জমির মালি-

জমা স্বত্ব স্বীকৃত হলেও তা হস্তান্তর যোগ্য নয় এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে জমির তুলনায় শ্রম ও অন্যান্য উপকরণের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হবে। প্রথমোক্ত স্তরের সমবায় সমিতি-গুলো পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় স্তরের সমবায়ে তখনই উন্নীত হবে যখন এগুলোর আওতাভুক্ত জমি পর্যাপ্ত পরিমানে একত্রীভূত করা সম্ভব হবে।

প্রস্তাবিত রূপরেখা সম্বন্ধে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে যে দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা। এমনকি এর যে সব পূর্বশর্তগুলোর কথা বলা হয়েছে তাও পূরণ করা সম্ভব কিনা।

একথা অনস্বীকার্য যে শ্রেনীবিভক্ত সমাজভিত্তিক কোনও দেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যে শ্রেনীটি আসীন থাকে মূলতঃ তাদের শ্রেনীস্বার্থ সংরক্ষণের উপযোগী করেই রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রনীত ও বাস্তবায়িত হতে থাকে। অনুরূপভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে সমবায়ের লক্ষ্য নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়নের ধারাও নিরূপিত হয়ে থাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামোর শ্রেনী চরিত্রের উপর। তাই পুঁজিবাদী দেশে সমবায় সংগঠনগুলোও পুঁজিবাদী স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমেই মূলতঃ ব্যবসায়িক নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। আবার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমবায় সংগঠন কৃষিতে মৌলিক রূপান্তরের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের শক্তিশালী বাহনরূপে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

এ প্রবন্ধে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা সহ বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এ দেশের কৃষি ব্যবস্থার কাম্য রূপান্তরের উপযোগী নয়। তাই নতুন সমবায় ব্যবস্থায় যে রূপরেখা উপস্থাপিত হয়েছে তাও বর্তমান পরিস্থিতিতে বাস্তবায়িত করা দুরূহ ব্যাপার। তবুও এ পরিস্থিতিতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন রূপান্তরের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে।

প্রথমতঃ পূর্বশর্ত হিসেবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে রাজনৈতিকভাবে শক্তি সমাবেশ করা প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষক এবং ক্ষেতমজুর সহ গ্রামীন জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত করে তাদের সচেতন করে তোলার প্রক্রিয়া মূলতঃ প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ এর অনুকূলে একটি সার্বজনীন ও উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলাও একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ। এ লক্ষ্যে সচেতনভাবে আন্দোলনের সৃষ্টি করতে হবে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোর রূপান্তর আনয়নের মাধ্যমে বর্তমান অসম ক্ষমতা কাঠামোর ভিত পরিবর্তন করতে পারলে ভূমি সংস্কার সহ অন্যান্য পদক্ষেপের মাধ্যমে অসম সম্পদ মালিকানা ব্যবস্থারও পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব হবে। তখনই সার্বিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তিত লক্ষ্যও কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে কৃষি ক্ষেত্রেও উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রচনার মাধ্যমে কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তরকে কাম্য লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন কৃষক ক্ষেতমজুর সহ দেশের শ্রমজীবী মানুষকে সচেতন ও সংগঠিত করে গড়ে তোলা। জনগণের এ বৃহত্তর অংশের অংশীদারত্ব ছাড়া যত নির্ভুল রূপরেখাই উপস্থাপন করা হোক তা কার্যতঃ কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই রাখতে সক্ষম হবে না।

পরিশিষ্ট

নতুন গ্রাম সমবায় ব্যবস্থাধীন স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও তার রূপরেখা

বাংলাদেশে কৃষি ব্যবস্থার কাম্য রূপান্তরের উপযোগী একটি নতুন গ্রাম সমবায় ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর রূপরেখা এখানে উপস্থাপন করা হল। এ ব্যবস্থায় বর্তমান সমবায় ব্যবস্থা-সহ স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকেও পুণর্গঠিত করে গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়েছে। পুণর্গঠিত ব্যবস্থাটিকে এক অর্থে কাঠামোগত মৌল পরিবর্তনেরও নামান্তর বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

পূর্বশর্ত

প্রস্তাবিত ব্যবস্থার দুটো পূর্বশর্ত রয়েছে। প্রথমতঃ এমন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে যেখানে প্রশাসন এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগনের সরাসরি ও সক্রিয় অংশগ্রহন নিশ্চিত করা যাবে। দ্বিতীয়তঃ জমিসহ উৎপাদনের উপকরণ সমূহের পুণর্বণ্টন ও পুণর্সমাবেশ করতে হবে।

প্রথম পূর্বশর্ত পালনের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার এরূপ বিকেন্দ্রীকরন প্রয়োজন যেখানে প্রকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রাধান্য বজায় থাকবে। বর্তমান সরকার ইতিমধ্যেই উপজেলা প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বলে আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়। প্রকৃত পক্ষে প্রশাসনকে জনগনের সন্নিকটে নিয়ে গেলেই বিকেন্দ্রীকরন ফলপ্রসূ হবেনা। এ প্রশাসনে জনগনের কর্তৃত্ব স্থাপন না করা পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণের মূল লক্ষ্য অর্জিত হবে না।

এ প্রসঙ্গে আরও প্রয়োজন বর্তমান উন্নয়ন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন। প্রাপ্ত স্থানীয় সম্পদ ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার এবং বাস্তবমুখী উন্নয়ন চাহিদা অনুযায়ী প্রশাসনিক প্রাথমিক স্তরে পরিকল্পনার প্রথম খসড়া তৈরী হবে। প্রকৃত পক্ষে গ্রাম থেকে এর উৎপত্তি হতে পারে যা উপজেলা পর্যায়ে একত্রীকরন ও সমন্বিত হবে এবং জেলা হয়ে সরকারের কেন্দ্রীয় স্তরে পৌছুবে। সেখানে জাতীয় চাহিদা এবং প্রাপ্ত সম্পদের পরিমানের ওপর ভিত্তি করে সংশোধনের সুপারিশ করা হবে যা পুনরায় প্রশাসনের নিম্নস্তরে (উপজেলায়) যেয়ে চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। এ ধরনের পরিকল্পনা একাধারে বাস্তবমুখী, জাতীয় লক্ষ্যের অনুকূল এবং জনগনের সক্রিয় অংশগ্রহনের নিশ্চয়তা দেবে, ফলে এর বাস্তবায়নের দক্ষতাও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয় পূর্বশর্ত পালন করতে হলে ভূমি মালিকানা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে ভূমির ব্যবহার এবং ভূমি ব্যবস্থাপনার পুণর্বিন্যাস প্রয়োজন। বাংলাদেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে ভূমি মালিকানা সীমিত করন একান্ত প্রয়োজন। প্রকৃত পক্ষে অসম সম্পদ মালিকানা দেশে যে বৈষম্যমূলক ক্ষমতার কাঠামো সৃষ্টি করেছে তা দূর করতে হলে শুধু ভূমি নয় অন্যান্য সম্পদের মালি-

কানায় বৈষম্যও দূর করতে হবে। অন্যথায় প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরনের মাধ্যমে প্রশাসন এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগনের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহনের নিশ্চয়তাও প্রদান করা সম্ভব হবেনা।

নতুন সমবায় গ্রাম

এ ব্যবস্থায় গ্রাম হবে আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে এক মৌল একক। উৎপাদনের প্রাথমিক স্তর এই গ্রাম। অবশ্য এ গ্রামের সীমিত উন্নয়ন ও প্রশাসনিক দায়িত্ব ও থাকবে। এ সমবায় গ্রাম প্রতিষ্ঠার জন্যে বর্তমান গ্রামগুলোর পূর্ণবিন্যাস প্রয়োজন হতে পারে।

উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠনের জন্যে একটি গ্রাম উৎপাদন সমিতি থাকবে। এ সমিতির আওতাভুক্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদন দল বা গ্রুপ থাকবে। প্রাথমিক প্রশাসনিক স্তর হিসেবে গ্রামের প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক অধিবাসী মিলে একটি গ্রাম সভা গঠন করবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি-দের দ্বারা একটি গ্রাম পরিষদ গঠিত হবে। অবশ্য গ্রাম উৎপাদন সমবায় গঠনের কাজ সমাপ্ত হলে যখন প্রতিটি গ্রামবাসী কোন না কোন উৎপাদন দলের সদস্য হবেন অর্থাৎ গ্রাম সমবায় প্রতিটি গ্রামবাসীর প্রতিনিধিত্ব করবে তখন গ্রাম পরিষদ এবং গ্রাম সমবায় কাঠামোর মধ্যে কার্যতঃ কোন প্রভেদ থাকবেনা।

গ্রাম পরিষদের কর্তব্য ও দায়িত্ব নিম্নলিখিত বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে:

(ক) গ্রামের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা,

(খ) শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সমাজ কল্যাণ বিষয়ে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব পালন,

(গ) অর্থনৈতিক অবকাঠামো সৃষ্টি, উৎপাদন উপকরন ও ভোগ্যপন্য সরবরাহ এবং বিপণন সংক্রান্ত কার্যাবলী (এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে রাস্তাঘাট নির্মান ও সংস্কার, জলনিস্কাশন, জল সরবরাহ, বিদ্যুতায়ন ইত্যাদি),

(ঘ) জমির রেকর্ড তৈরী এবং জমির ক্রয়-বিক্রয় ও হস্তান্তর সম্পর্কিত কার্যাবলী নিয়ন্ত্রন,

(ঙ) উৎপাদন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

পরবর্তি কোন এক পর্যায়ে সমস্ত গ্রামটিকে এমন পরিকল্পিতভাবে পুণর্গঠিত করতে হবে যেন বাসগৃহগুলো সুশৃংখলভাবে তৈরী করে বসতবাটি সংলগ্ন জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদান করা যায় এবং সর্বনিম্ন ব্যয়ে জল এবং বিদ্যুত সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

এই সুসংহত গ্রামে একটি গ্রাম কেন্দ্র থাকবে। সেখানে মিলনায়তন, স্কুল, ক্রীড়া ও বিনোদন কেন্দ্র, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিপনী, গুদাম ও মাড়াই কেন্দ্র সমূহ ইত্যাদি থাকবে।

সমবায় সংগঠনের কাঠামো

প্রকৃত পক্ষে নতুন গ্রাম হবে একটি অত্যন্ত সুসংগঠিত সমবায় উৎপাদনের একক। পেশা ভিত্তিক বিভিন্ন দল থাকবে এ সমবায় সমিতির অঙ্গ সংগঠন হিসেবে। স্বভাবতঃই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দলগুলো হবে কৃষি উৎপাদন বিষয়ক। এগুলো বিভিন্ন উৎপাদন ব্লকে বিভক্ত থাকবে। প্রত্যেকটি দলের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হবে গ্রাম সমবায় পরিচালনা কমিটি। গ্রাম সমবায়ের নেতৃত্বে এভাবে বিভিন্ন শ্রেনীর প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হবে এবং কায়েমী স্বার্থবাদী নেতৃত্ব বিকাশের পথে এটি বাধা হিসেবে কাজ করবে।

গ্রাম সমবায় গ্রামের কৃষি উৎপাদন সহ সকল উৎপাদন কর্মসূচীর পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং তদারকীর দায়িত্ব পালন করবে। গ্রাম পরিষদের মাধ্যমে বিভিন্ন উৎপাদনের উপকরন সমূহ গ্রাম সমবায় সংগ্রহ করবে এবং এর আওতাভুক্ত বিভিন্ন উৎপাদন গ্রুপকে সরবরাহ করবে। সংগঠন আয়-ব্যয়ের হিসাব সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংরক্ষণ করবে। এর জন্য প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ করা হবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রামের সকল কৃষি জমিকে কয়েকটি উৎপাদন ব্লকে ভাগ করা হবে। প্রত্যেক ব্লকের জন্য ব্লক প্রধান থাকবেন। ব্লকের বাইরে বাসগৃহ সংলগ্ন কিছু জমি সদস্যগণ ফল, তরিতরকারী চাষ এবং গৃহ পালিত পশু-পাখী পালনের কাজে ব্যবহার করার জন্যে রাখতে পারবেন।

প্রতিটি ব্লকে সে ব্লকের জমির মালিকগণ সহ ভূমিহীন কৃষক ও বর্গাদারগণও সদস্য হতে পারবেন। ভূমি মালিকানায় সিলিং সাপেক্ষে যে সব জমি মালিকদের পারিবারিক শ্রম দ্বারা চাষ করা হবে না সেগুলো এবং অনুপস্থিত মালিকদের জমি (অর্থাৎ যে সব জমি পূর্বে বর্গা ইত্যাদি প্রথায় চাষ করা হতো) সমবায় উৎপাদন ব্লকের আওতাধীনে ব্যবহার করা হবে এবং প্রান্তিক চাষী এবং অন্যান্য বর্গাদারদের মাধ্যমে সমবায় কর্তৃক চাষ করা হবে। উৎপাদনের উপকরণ সমূহ গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে সংগৃহীত হবে এবং উৎপাদন ব্লক তার সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করবে। যেহেতু জমির চাহিদা অনুযায়ী মালিকানা নির্বিশেষে ব্লকের প্রতিটি প্লটে সমিতি কর্তৃক উৎপাদন উপকরন সরবরাহ করা হবে, পুরো ব্লকের তথা গ্রামের সমস্ত জমির গড় উৎপাদন উল্লেখ্যযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাবে।

সমবায় সমিতি ক্ষেত্র বিশেষে জমির ব্যবহারাধিকার লাভ করলেও জমির মালিকানায় এ পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করা হবেনা। তবে জমির নতুন সিলিং নির্ধারনের পর স্বভাবতঃই কিছু জমি উদ্বৃত্ত হিসেবে পাওয়া যাবে যেগুলো সমবায়ের আওতায় আসবে। নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী ক্ষতিপূরনের দিকটিও গ্রাম সমবায়ের ব্যবস্থাপনায় আসতে পারে। তবে ভূমি সংস্কারের এই দিকটি অর্থাৎ উদ্বৃত্ত জমি বের করা এবং তার সুষ্ঠু বণ্টন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা স্থানীয় জনসাধারন তথা স্থানীয় সংস্থা এবং সরকারী প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে। এ কমিটিতে ভূমিহীন কৃষক ক্ষেতমজুরদের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব থাকা বান্ছনীয়। উদ্বৃত্ত

জমির ঘোষণা জনসমক্ষে প্রকাশিত হতে হবে যাতে জনগন কর্তৃক প্রয়োজন বোধে তা সংশোধন করা সম্ভব হয়।

এ ছাড়া জমির তালিকা এবং রেকর্ড প্রণয়নে গ্রাম পরিষদের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব থাকবে। অবশ্য উপজেলা পর্যায়ে জমির রেকর্ড সংরক্ষন করা যেতে পারে।

সকল জমির ক্রয়-বিক্রয় এবং হস্তান্তর কার্যাবলী গ্রাম পরিষদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। সাধারনতঃ অনুপস্থিত মালিকদের জমি ক্রয়, বিক্রয় বা হস্তান্তর সম্পর্কিত কোন অবাধ অধিকার থাকবে না। এসব বিষয়ে গ্রাম পরিষদের পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন হবে। কৃষি জমি সাধারনতঃ অনুৎপাদক অথবা অনুপস্থিত মালিকের নিকট বিক্রয় করা যাবেনা, কেবলমাত্র গ্রাম সমবায়, উৎপাদন ব্লক অথবা তার অন্তর্ভুক্ত উৎপাদক সদস্যের নিকট (মালিকানা সিলিং সাপেক্ষে) বিক্রয় করা যাবে।

এ ব্যবস্থায় প্রকৃত পক্ষে বর্তমান বর্গাপ্রথা উচ্ছেদের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এক অর্থে বর্গা পদ্ধতি থাকবে তবে এটা সরাসরি মালিক-বর্গাদারের মধ্যে নয়। গ্রাম সমবায় বা তার পক্ষে উৎপাদন ব্লক অনেকাংশে মালিকের ভূমিকা পালন করবে। অবশ্য ঐ ব্যবস্থায় উৎপাদন ব্লক কর্তৃক উৎপাদন উপকরন সমূহ সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে। উপরন্তু, ফসলের বণ্টন পদ্ধতি ভিন্ন হবে। গ্রাম পরিষদ বা গ্রাম সমবায় কর্তৃক বণ্টনের বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে। তবে এ বিষয়ে মৌল নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে জাতীয় পর্যায়ে। মৌল নীতিমালায় কাঠামোর মধ্যে স্থানীয়ভাবে বণ্টনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নির্ধারন করা হবে।

বণ্টন পদ্ধতি

গ্রাম সমবায় পদ্ধতির আওতায় চাষাবাদে ফসল কাটার পর সেগুলো গ্রামের নির্ধারিত ফসল মাড়াই কেন্দ্রে আনয়ন করা হবে। প্রয়োজনবোধে কোনও কোনও গ্রামে একাধিক মাড়াইকেন্দ্র থাকতে পারে। মাড়াইকেন্দ্রে ফসল মাড়াই এবং শুকানোর পর ফসলের একটি অংশ সমবায় ঋণ দেয়া উপকরন মূল্য এবং অন্যান্য খরচ বাদে রেখে দেবে। পরবর্তী ফসলের জন্য বীজও তখন সংরক্ষণ করা হবে। আর একটি নির্ধারিত অংশ নির্ধারিত হবে সমবায়ের সঞ্চয় বা মূলধন তহবিল গঠনের জন্যে, গ্রাম পরিষদকে দেয় উন্নয়ন তহবিলের অংশ হিসেবে এবং গ্রাম পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত বিভিন্ন তহবিলে। এরপর যা থাকবে তা সদস্যদের মধ্যে বিতরিত হবে। জমি এবং শ্রমের আনুপাতিক হারে এ বণ্টনের নীতিমালা প্রণীত হবে।

এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে কোন অপরিবর্তনীয় নীতিমালা গ্রহণ করা উচিত হবেনা। স্থান-কাল ভেদে বিভিন্ন কারনে এটা স্বাভাবিক ভাবেই পরিবর্তনশীল হবে। তবে একটি সাধারন নীতিমালা নির্ধারন করে দেয়া যেতে পারে। উপকরন, পরিচালনা খরচ, মূলধন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে ৩৩·৩% থেকে ৪০% ফসল রাখা যেতে পারে এবং বাকি ৬০ থেকে ৬৬% জমি এবং শ্রমের মধ্যে বিতরন করা যেতে পারে। জমি এবং শ্রমের মূল্য প্রাথমিক পর্যায়ে সমান হারে

নেয়া যেতে পারে। তবে পর্যায়ক্রমে শ্রমের প্রাপ্য অংশ বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং এভাবে নিম্নস্তর থেকে উচ্চ স্তরের বৃহত্তর সমবায়ের দিকে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

যৌথ উৎপাদন পরিকল্পনা, উৎপাদন এবং ব্যবস্থাপনা কৃষি সহ অন্যান্য পেশাগত দলের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রয়োগ হবে। গ্রাম সমবায়ের সাধারন নিয়ন্ত্রনের মধ্যে থেকেও আভ্যন্তরিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন দলগুলোর মধ্যে তাদের কর্মসূচী পরিচালনায় প্রয়োজনীয় স্বায়ত্বশাসন অক্ষুণ্ণ থাকবে।

গ্রামের উদ্বৃত্ত ফসল এবং অন্যান্য পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। সমবায় গ্রাম পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত ফসল এবং ক্রয়কৃত উদ্বৃত্ত ফসল গ্রাম ফসল সংরক্ষণাগারে মজুত রাখা হবে। সরকার এসব গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে তার ফসল সংগ্রহ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবেন। সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত উৎপাদন উপকরনের মূল্যও গ্রাম সমবায় তার সংগৃহীত ফসলের মাধ্যমে (আংশিক ভাবে) প্রদান করতে পারবে।

ফসল সংরক্ষণ ও বিপণনের এ পদ্ধতি গ্রহনের ফলে সরকারের বর্তমান ফসল সংগ্রহ অভিযানের বহু ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করা যাবে। অপচয়েরও লাঘব হবে উল্লেখযোগ্য পরিমানে। এ ছাড়া মজুদদারী, চোরাকারবার এবং ফটকাবাজারীও এ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

এ ব্যবস্থার সুফলগুলো নিম্নলিখিত ভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে:

(ক) বর্তমান ভূমি মালিকানায় ও উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় পরিকল্পিতভাবে জমির একত্রিকরন এবং জমি, শ্রম এবং অন্যান্য উপকরন সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারও সহজতর হবে।

(খ) গ্রামীন উৎপাদন কর্মকাণ্ড সমন্বিত ভাবে পরিচালনার মাধমে গ্রামীন জনশক্তির মধ্যে যৌথ চেতনাবোধ সৃষ্টি হবে এবং বৈষম্যমূলক উৎপাদন ব্যবস্থা দূর করা সম্ভব হবে।

(গ) উৎপাদন এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বহুমুখীকরনের মাধ্যমে স্বয়ম্ভর পদ্ধতির উন্নয়ন প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে।

(ঘ) একটি সুসম বণ্টন ব্যবস্থার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে।

উচ্চতর প্রশাসনিক ও উন্নয়ন স্তরের সাথে সমবায় গ্রামের সম্পর্ক

গ্রামের উৎপাদন কর্মকাণ্ডে এবং গ্রাম পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সমর্থন দানের জন্য উপজেলা পরিষদকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। বর্তমান সরকার নীতিগতভাবে ইতিমধ্যেই উপজেলাকে প্রশাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছেন।

উপজেলা পরিষদের প্রধান থাকবেন একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। অন্যান্য নির্বাচিত সদস্য ছাড়া উপজেলা প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দও এ পরিষদের সদস্য থাকবেন। উপজেলা পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের কর্তব্য পালনের ব্যাপারে উপজেলা পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন। উপজেলা পরিষদ তার আওতাভুক্ত এলাকার সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পরিচালনা ও সমন্বয় করবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করবেন।

যে সব কর্মকাণ্ড গ্রাম পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে সমাধা করা সম্ভব নয় অথবা যে সব কর্মকাণ্ডের পরিধি গ্রামের উর্দ্ধে মূলতঃ সেগুলো উপজেলা পরিষদের আওতাভুক্ত থাকবে। উপজেলা পরিষদ তার এলাকাভুক্ত গ্রামগুলোর চাহিদা এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে, গ্রামগুলোর মধ্যে উৎপাদনের উপকরন সমূহ বণ্টন করবে এবং গ্রামগুলোর উন্নয়ন কর্মসূচী তদারকী করবে।

পরিষদ এলাকার জনশক্তি সংগঠিত করে তাদের কর্মসংস্থানের বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করবে। এলক্ষ্যে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় গ্রামীন ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সংস্থাপনের ব্যবস্থা করবে। কৃষি যন্ত্রপাতি ও উপকরন তৈরীর কারখানা ছাড়াও এগুলোর মেরামত, যন্ত্রাংশ তৈরী এবং রক্ষণা-বেক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করবে।

বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন এবং বিপরীত মুখী চাহিদার সমন্বয় সাধন করবে উপজেলা পরিষদ। এ ছাড়া বিভিন্ন গ্রামের সেচ ও জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, পানি, বিদ্যুত, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়েও গ্রামগুলোর কর্মসূচী বাস্তবায়নে সাহায্য করবে ও সমন্বয় সাধন করবে।

ইউনিয়ন পরিষদের বিলুপ্তি

যেহেতু উপরের কাঠামোতে গ্রাম এবং উপজেলার মধ্যে সরাসরি সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাই প্রশ্ন ওঠতে পারে যে তা হলে এ ব্যবস্থায় ইউনিয়নের অবস্থান কোথায়। নতুন ব্যবস্থায় একদিকে গ্রামের ভৌগোলিক পরিধির পূণর্গঠন প্রয়োজন হবে অপর দিকে উপজেলার পরিধিও পূণর্গঠিত করতে হবে। উপজেলার অবস্থান এমন হতে হবে যেন গ্রাম এবং উপজেলা কেন্দ্রের মধ্যে সহজে সরাসরি সম্পর্ক রচনা করা সম্ভব হয়। তাতে করে দেশে উপজেলার সংখ্যা অবধারিত ভাবে বৃদ্ধি পাবে।

এ অবস্থা যখন সৃষ্টি হবে তখন বাস্তবে আর ইউনিয়নের বর্তমান কাঠামোটি বজায় রাখার কোনই প্রয়োজন থাকবেনা। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে বাংলাদেশে বর্তমান ইউনিয়ন অর্থবহ কোন আর্থ-সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক একক হিসেবে অবদান রাখছে না। রাজনৈতিক প্রয়োজনে বর্তমান অসম গ্রামীন ক্ষমতার কাঠামোকে ভেঙ্গে দিতে হলে এবং আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে মৌল পরিবর্তন আনয়ন করতে হলে ইউনিয়নকে তুলে দেয়া প্রয়োজন। বর্তমানে ইউনিয়নগুলো যে অর্থনৈতিক কর্ম- কাণ্ড পরিচালনা করছে তা গ্রামোন্নয়নের সহায়ক না হয়ে পরিপন্থীই হচ্ছে। এর দায়িত্বগুলো প্রস্তাবিত গ্রাম ও উপজেলা কর্তৃক অধিকতর সফলতার সাথে পরিচালিত করা সম্ভব

হবে। এছাড়া দেশের প্রশাসনিক কাঠামোর একটি স্তর কমে যাবার ফলে, পরিকল্পনা, উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যোগাযোগ এবং সমন্বয় সহজতর হবে বলেই ধারনা করা হচ্ছে।

আপাততঃ ইউনিয়নকে একটি প্রতীক ইউনিট হিসেবে রেখে দেয়া যায় যার ভিত্তিতে উপ-জেলার অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলোকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আর্থ-সামাজিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ নির্ধারন করা যাবে। ইউনিয়নকে প্রশাসনিক বা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কাঠামোর মধ্যে আলাদা কোন ক্ষমতা প্রদান করার প্রয়োজন নেই।

REFERENCES

Ali, M. Muzaffar (1976) : *Impact of Comilla Model Co-operatives on Socioeconomic Conditions of the Farmer* M.Sc. Thesis Submitted to the Dept. of Co-operation & Marketing, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh.

Ballendux, A.H. and R.K. Harper (undated) ; *A Survey of the Co-operative Movement in East Pakistan* (Ed. by S.N.H. Rizvi). Dhaka : Govt. of East Pakistan.

Blair, H.W. (1974) : *The Elusiveness of Equity : Institutional Approaches to Rural Development in Bangladesh.* Ithaca : Cornell University.

Government of Bangladesh (1973) : *The First Five Year Plan.* Dhaka : Planning Commission.

————(1980) : *The Second Five Year Plan.* Dhaka : Planning Commission.

Husain, A.M.M. (1964) : *A Model Co-operative Organization for Agricultural Development in East Pakistan.* Ph. D. Dissertation Submitted to Texas A & M University, College Station.

Husain, A.M.M., M.A. Jabbar, M.A.S. Mandal and W.M.H. Jaim (1984) : *Tangail Agricultural Development Project : Report on Socioeconomic Study of Tubewell Schemes.* Mymensingh : BSERT.

Khan, A.R. (1978) : "The Comilla Model and the Integrated Rural Development Programme in Bangladesh : An Experiment in Co-operative Capitalism". *World Development*, 7, 415, 397-422.